বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, চুয়াল্লিশতম খণ্ড, গ্রীষ্ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩/জুন ২০২৬
DOI: https://doi.org/10.64298/jasbbn.v44i.008

‘না কান্দে বুবু’ ও *শিম কীভাবে রান্না করতে হয়* : সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র ডায়াসপোরা ন্যারেটিভ

নিপা জাহান*

সারসংক্ষেপ

পেশাগত কারণে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ তাঁর জীবৎকালের অনেকটা সময় জন্মভূমির বাইরে অবস্থান করেছেন। ফলে দীর্ঘ সময়ের সাংস্কৃতিক অভিযোজন-সংকট, স্থানচ্যুতিগত যন্ত্রণা, অতীতচারিতা এবং আত্মপরিচয়গত সংকট তাঁর রচিত সাহিত্যের উপজীব্য হয়েছে। সংখ্যাগত দিক থেকে এই লেখকের স্বল্পসংখ্যক রচনাতেই ডায়াসপোরা ন্যারেটিভের সন্ধান করা সম্ভব। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ‘না কান্দে বুবু’ গল্প এবং *শিম কীভাবে রান্না করতে হয়* উপন্যাস। বর্তমান প্রবন্ধে ‘না কান্দে বুবু’ গল্পের প্রধান চরিত্রকে কর্মসূত্রে ডায়াসপোরা হিসেবে চিহ্নিত করে তার মনস্তাত্ত্বিক ও পারিবারিক সংকটের ধরন ও কারণ উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রবন্ধের দ্বিতীয় প্রতিপাদ্য টেক্সট *শিম কীভাবে রান্না করতে হয়*-এর বিষয় ডায়াসপোরা জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক দূরত্ব ও সংকট। উপনিবেশোত্তর পৃথিবীতে উপনিবেশক ও উপনিবেশিতের মনস্তত্ত্বের স্বরূপ এবং এ-সূত্রে একজন ডায়াসপোরিকের অভিজ্ঞতা ও এর কার্যকারণ সন্ধান করা হয়েছে এই টেক্সটের আলোচনায়। দেশীয় প্রেক্ষাপটে একটি গল্প ও মহাদেশীয় প্রেক্ষাপটে একটি উপন্যাস বিশ্লেষণ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশের ডায়াসপোরা ন্যারেটর হিসেবে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র জীবনাভিজ্ঞতা ও রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক দীক্ষারও পরিচয় উঠে এসেছে বর্তমান প্রবন্ধে।

চাবি শব্দ : সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, ডায়াসপোরা, আদারনেস, উত্তর-উপনিবেশবাদ, সাংস্কৃতিক অভিযোজন।

এক

স্বতন্ত্র গদ্যরীতি ও স্বকীয় বিষয়নির্বাচনের জন্য সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ (১৯২২-১৯৭১) বাংলা সাহিত্যের অনন্য কথাসাহিত্যিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। তাঁর প্রাগ্রসর চিন্তা ও নির্মাণ সাহিত্যিক হিসেবে আবির্ভাবকাল থেকে প্রাসঙ্গিকতা বহন করে সমকালস্পর্শী হয়ে উঠতে পেরেছে। পেশাগত কারণে তিনি দেড় দশকেরও বেশি সময় স্বদেশের বাইরে বসবাস করেছেন এবং প্রবাসে মৃত্যুবরণও করেছেন। সুদীর্ঘ প্রবাসজীবনে সাংস্কৃতিক অভিযোজনগত সংকট, গৃহকাতরতা, অতীতচারিতার মতো বিষয় প্রতিনিয়তই এই কথাসাহিত্যিকের অভিজ্ঞতায় সঞ্চিত হয়েছে। এই অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির কিছুটা সঞ্চারিত হয়েছে তাঁর বেশ কিছু রচনায়। বিশেষ করে নৈঃসঙ্গ্যচেতনা ও অতীতচারিতা সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র গল্প-উপন্যাসের চরিত্রসমূহের অস্তিত্ব জিজ্ঞাসায় গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে হাজির হয়েছে। কেবল প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নয়, পরোক্ষ অভিজ্ঞতা ও উপাদানেও তাঁর কথাসাহিত্যে ডায়াসপোরা ন্যারেটিভ সৃষ্টি হয়েছে।

---

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়।

দুই

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য বাংলাদেশের মানুষ ও তাদের যাপন-বাস্তবতার নানাদিক। এর রূপায়ণে তিনি তত্ত্বগত দিক থেকে বেছে নিয়েছিলেন অস্তিত্ববাদকে। সরকারি চাকুরে বাবার বদলিজনিত কারণে কোনো স্থান বা এলাকায় তাঁর দীর্ঘবাস হয়ে ওঠেনি। আবার কর্মজীবনের প্রায় পুরোটা সময় তিনি দিল্লি, করাচি এবং অস্ট্রেলিয়া ও ফ্রান্সের বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করেছেন। ফরাসি নাগরিক আন মারিকে বিয়ে করেছিলেন তিনি। কিন্তু ওয়ালীউল্লাহ্‌র সাহিত্যের প্রায় প্রতি ছত্রে ধৃত হয়ে আছে তাঁর জন্মভূমি, বাংলাদেশ। এর মধ্যে দেশে ব্রিটিশ ও পশ্চিম পাকিস্তানের দুই ঔপনিবেশিক কাল অতিবাহিত হয়েছে। রাজনৈতিক, সমাজিক ও সাংস্কৃতিক পর্বান্তর তাঁর রচনায় প্রচ্ছন্নভাবে ছড়িয়ে রয়েছে। তাই উপনিবেশোত্তর নানা চিন্তা ও তত্ত্বের দ্বারাও বিশ্লেষিত হয়েছে তাঁর সাহিত্য। বিশেষত তাঁর *দ্য আগলি এশিয়ান (কদর্য এশীয়)* উপন্যাসটি আদ্যোপান্ত উত্তর-ঔপনিবেশিক টেক্সট। বাংলাদেশের প্রথম ডায়াসপোরা ন্যারেটর তথা দক্ষিণ এশিয়ার গুরুত্বপূর্ণ লেখক হিসেবে তিনি বিবেচিত হতে পারেন; যদিও এই স্বীকৃতি অদ্যাবধি সংশয়পূর্ণ।[১] ১৯৪৭ সালে ভারতভাগের ফলে এদেশে বহুসংখ্যক মানুষকে বাস্তুচ্যুত হতে হয়েছিল। প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌ এই সংকটকে গভীরভাবে অনুধাবন করেছিলেন। ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত *দুই তীর ও অন্যান্য* গল্প গ্রন্থের 'একটি তুলসীগাছের কাহিনী' গল্পের চরিত্রদের শরণার্থী জীবনের চিত্রায়ণে গল্পকার তাঁর এই অভিজ্ঞতারই প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। বর্তমান প্রবন্ধের মূল আলোচ্য 'না কান্দে বুবু' গল্প ও *শিম কীভাবে রান্না করতে হয়* উপন্যাস। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র ডায়াসপোরা ন্যারেটিভ সন্ধান-প্রকল্পের আলোচনা-প্রবেশক হিসেবে ডায়াসপোরা তত্ত্বের সংক্ষিপ্ত ও প্রাসঙ্গিক রূপরেখা উপস্থাপন করা আবশ্যক।

তিন

উৎসগত দিক থেকে Diaspora শব্দটি গ্রিক। Dio মানে দূরে, Speirein মানে ছড়িয়ে পড়া। ডায়াসপোরা (Diaspeirein—a scattering [of seeds]) পরিভাষাটি দ্বারা জোরপূর্বক বা স্বেচ্ছায় স্থায়ী বসতি অঞ্চল ত্যাগ করে সুদূরে বসবাসকারী জাতিগোষ্ঠীকে বোঝায়—এদের সংস্কৃতি যাযাবর সংস্কৃতির একেবারেই বিপরীত এবং উদ্বাস্তু গোষ্ঠীর সংস্কৃতির সঙ্গে কিছুটা সাযুজ্যপূর্ণ। তবে উদ্বাস্তুরা শেষ পর্যন্ত কোনো ভৌগোলিক অঞ্চলে স্থায়ী বসতি স্থাপনের বিষয়ে সন্দিহান থাকে। কিন্তু ডায়াসপোরা জনগোষ্ঠী স্থায়ীভাবে স্থানান্তরিত ও পুনর্স্থাপিত হয়।

নির্বাসনের ফল হিসেবেই ডায়াসপোরা প্রসঙ্গের অবতারণা ঘটেছিল, যার প্রথম উল্লেখ দেখা যায় *বাইবেলের* ওল্ড টেস্টামেন্টের পঞ্চম গ্রন্থে। ইজরায়েল থেকে নির্বাসিত ইহুদি জনগোষ্ঠী প্রসঙ্গে আনুমানিক ৬০৭ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে ডায়াসপোরা শব্দটির প্রয়োগ ঘটে।[২] পরবর্তীকালে ১৯৫০-এর মধ্যপর্যায়ে এই পরিভাষাটি ইংরেজি ভাষায় ব্যাপকভাবে অঙ্গীভূত হয়। বর্তমানে কোনো বিশেষ দেশ বা অঞ্চল থেকে দীর্ঘকালীন দেশান্তরীদের উল্লেখের ক্ষেত্রে এই পরিভাষাটির ব্যাপক ব্যবহার হয়ে থাকে।

ডায়াসপোরা পরিস্থিতিতে বসবাসকারী (অর্থাৎ কোনো কারণে নির্বাসন বা জীবিকার অন্বেষণে স্বদেশ ছেড়ে ভিনদেশে বাস করেছেন এমন) কোনো লেখক যে সৃজনশীল সাহিত্য রচনা করেন, তা ডায়াসপোরা সাহিত্য। এর আবার দুটি ধরন—প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ। সাধারণত ডায়াসপোরা জীবনে থেকে স্বদেশ (হোমল্যান্ড) এবং আশ্রিত দেশের (হোস্টল্যান্ড) মধ্যকার টানাপড়েন উঠে আসে প্রত্যক্ষ ডায়াসপোরা সাহিত্যে। আর আশ্রিত দেশের সংকট বা জনজীবন উপজীব্য করে কিংবা স্বদেশের কোনো রাজনৈতিক-সামাজিক বিষয় নিয়ে সৃষ্ট সাহিত্য বিবেচিত হয় পরোক্ষ ডায়াসপোরিক সাহিত্য হিসেবে।[৩] ডায়াসপোরা সাহিত্য-গবেষক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র এই সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানান :

> ডায়াসপোরা সাহিত্যতত্ত্বে কিছু বিষয় প্রণিধানযোগ্য, যেমন : গৃহত্যাগ করা, নিজ বাসভূমের জন্য স্মৃতিকাতর হয়ে পড়া, নতুন ভূমিতে একাকিত্ব বোধ করা, সমঝোতা করা, নতুনভাবে নিজের আত্মপরিচয় নির্মাণ করা, দুই দেশের সংস্কৃতি ও ইতিহাসের ভেতর আটকে পড়া; প্রভৃতি। এসব কারণে ডায়াসপোরাকে বলা হচ্ছে জাতীয়তাবাদ উত্তর (Post-Nationalism) কাল।[৪]

ডায়াসপোরা সাহিত্যতত্ত্বের উদ্ভব উত্তর-ঔপনিবেশিক কালে। সাংস্কৃতিক অধ্যয়ন-এর আওতায় এর পাঠ অদ্যাবধি প্রতিষ্ঠিত। সাংস্কৃতিক অভিযোজনগত সংকটকে ডায়াসপোরা জনগোষ্ঠীর জীবন-বাস্তবতায় সবচেয়ে গভীর ও জটিল সমস্যারূপে চিহ্নিত করা হয়। স্টুয়ার্ট হল এই জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয়ের প্রবক্তা। ডায়াসপোরা জনগোষ্ঠী হোস্টল্যান্ড ও হোমল্যান্ডের সংস্কৃতির মধ্যে সমন্বয় সাধনে তৎপর থাকে। তারা দ্বৈত পরিচয়ের (hybrid identity) ধারক হলেও হোমল্যান্ডের যাপন, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে স্মৃতি ও সত্তায় ধারণ করে, আর এটি অনেকটা অনড় বা অবিকৃত আকারে তাদেরকে অতীতচারী করে তোলে; হোমল্যান্ডের পরিবর্তনের সঙ্গে এর কোনো যোগ থাকে না। স্টুয়ার্ট হল একে 'ফ্রোজেন টাইম' হিসেবে অভিহিত করেন। বর্তমান প্রবন্ধের অন্যতম আলোচ্য গল্প 'না কান্দে বুবু'তে এই প্রসঙ্গের প্রতিফলন লক্ষ করা যাবে। ঝুম্পা লাহিড়ীর *দ্য নেমসেক* উপন্যাসে ফ্রোজেন টাইমের চমৎকার রূপায়ণ দেখা যায় অশোকের স্মৃতি-সত্তা ও মূল্যবোধের সূত্রে। পল গিলরয় তাঁর *দ্য ব্ল্যাক আটলান্টিক : মডার্নিটি এন্ড ডাবল কনসিয়াসনেস* গ্রন্থে অ্যাংলো আফ্রিকান ডায়াসপোরা জনগোষ্ঠীর সূত্র ধরে তাদের আত্মপরিচয়ের সংকটকে তুলে ধরেছেন। জেমস ক্লিফোর্ড ডায়াসপোরা ব্যাপারটিকে ভ্রমণ বা স্থানান্তরের একটি বিশেষ রূপ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। তিনি এই ভ্রমণ বা স্থানান্তরের ফলে আশ্রয়দাতা দেশের সংস্কৃতির সঙ্গে ব্যক্তির এক ধরনের টানাপড়েন সৃষ্টির কথা বলেছেন। তারও আগে এডওয়ার্ড সাইদ ও হোমি কে. ভাবার রচনাতেও উত্তর-ঔপনিবেশিক দৃষ্টিকোণ থেকে ডায়াসপোরা জনগোষ্ঠীর এই সংকটের ধরন ও কার্যকারণ-এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ উঠে এসেছিল। হোমি ভাবা 'থার্ড স্পেস'-এর কথা বলেন। হোমল্যান্ড ও হোস্টল্যান্ড-এর মধ্যে ডায়াসপোরিক ব্যক্তি সমন্বয় করতে গিয়ে তার চিন্তা ও আচরণের জন্য তৃতীয় একটি জগৎ তৈরি করে নেয়। পরিবর্তিত প্রতিবেশে নিজেকে খাপ খাওয়াতে সতর্কতার মাধ্যমে নিজেকে প্রস্তুত করে নিতে থার্ড স্পেস গুরুত্বপূর্ণ। *শিম কীভাবে রান্না করতে হয়* উপন্যাসের কথকের মধ্যে এই ব্যাপারটির স্পষ্ট উপস্থিত দেখা যায়।

চার

মানুষ ও লেখক হিসেবে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ছিলেন বৈশ্বিক-চেতনার। তাই ঢাকা, কলকাতা, করাচি, সিডনি বা প্যারিস—যেখানেই অবস্থান করুন না কেন তাঁর রচনার মূল বিষয় স্বদেশচ্যুত হয়নি এটা যেমন সত্য তেমনি সত্য তাঁর উপস্থাপন-শৈলীর অভিনবত্ব। এই অভিনবত্বকে চিহ্নিত করা যায় সর্বৈব বৈশ্বিক মানদণ্ডে। তাই আলাপচারিতায় বাংলা সাহিত্যের গতানুগতিকতা ছাপিয়ে লেখা প্রথম উপন্যাস *লালসালু* সেসময় অনাদৃত হলে লেখকের মনোভাব ফুটে উঠে কাজী আফসার উদ্দিনের সাক্ষ্যে :

> লালসালু যথেষ্ট বিক্রি না হওয়ায় তিনি হতাশ হয়েছিলেন। আমাকে বলেন, ইংরেজিতে উপন্যাস লিখব। বললাম, ইংরেজিতে কেন? বললেন, বাংলার পাঠক কোথায়? পাঠক যা পড়তে চায়, আমি তা লিখতে পারব না।[৫]

অর্থাৎ বিদ্যমান পাঠক-রুচি থেকে অগ্রবর্তী লেখক হিসেবে সমকালে অনেকটা অনাদরণীয় ওয়ালীউল্লাহ্‌র শেষ দুটি উপন্যাস ইংরেজি ভাষায় লিখিত আকারে আবিষ্কারের সূত্রও অনেকাংশে একই ব্যাপার (এ-প্রসঙ্গে পরে আলোচিত হবে) এমনটি বললে সম্ভবত ভুল হবে না। শেকড় তথা আত্মপরিচয়-সচেতন লেখক হিসেবে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে চর্চিত তত্ত্ব-পরিভাষা-শৈলী আত্মকরণের মাধ্যমে রচনায় প্রয়োগ করেছিলেন। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ সম্পর্কে আন মারির লিখিত স্মৃতিকথায় ১৯৫৪ সালে এক পত্রে এই সাহিত্যিক লিখেছেন :

> ...আমি যাদের চিনতাম, তারা যে এক বৃহৎ সামাজিক-অর্থনৈতিক বুনোটের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ সেটা বোঝানোই আমার লক্ষ্য।...আমার লেখা বই আমার নাটক, আমার গল্পগুলো ব্যক্তি অভিজ্ঞতার ফটোগ্রাফিক প্রতিফলন নয়, বরং এগুলো তার চেয়ে বেশি কিছু।[৬]

সমকালে তা তেমন আদৃত না হলেও ভাবীকালে তা পরম অনুসন্ধানী হিসেবে পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। লেখকের ক্রম-পাঠ্য হবার এই ইতিবৃত্তের মধ্যেই তাঁকে ডায়াসপোরা ন্যারেটর হিসেবে আবিষ্কারের এই প্রচেষ্টা।

'না কান্দে বুবু' গল্প বর্তমান প্রবন্ধের গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য নির্ধারিত হয়েছে এর বিষয়গত কারণে। তবে ডায়াসপোরা ন্যারেটিভ ওয়ালীউল্লাহ্‌র গল্পে এর বেশ আগে থেকেই স্থান করে নিয়েছিল। এর দৃষ্টান্ত 'জাহাজী' ও 'একটি তুলসীগাছের কাহিনী' গল্পদ্বয়। দক্ষিণ এশিয়ার ডায়াসপোরা সাহিত্যের ঠিকুজি ও পরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থের লেখক জানান :

> সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ নিজে দীর্ঘ সময় প্রবাস জীবনে ছিলেন। বিদেশে বসে লেখা গল্প-উপন্যাসে তাঁর নিজের ডায়াসপোরা অনুভূতি নিয়ে কিছু না জানা গেলেও তিনি যখন 'একটি তুলসী গাছের আত্মকাহিনী' (সংশোধন : একটি তুলসীগাছের কাহিনী) লেখেন, তখন সেখানে দেশভাগের ফলে সৃষ্ট দুই বাংলার ডায়াসপোরা জনগোষ্ঠীর আবেগ-অনুভূতি ও বিচ্ছিন্নতার কথা জানতে পারি।[৭]

ওয়ালীউল্লাহ্‌র গল্প-উপন্যাসে ডায়াসপোরা অনুভূতির রূপায়ণ প্রসঙ্গে গ্রন্থকারের এই মন্তব্য যে পূর্বাপর ঠিক নয় বর্তমান প্রবন্ধে তা উঠে আসবে। মূলত ১৯৪৭ সালে ভারতভাগের রাজনৈতিক ঘটনায় পৃথক দুটি রাষ্ট্রের সৃষ্টিতে আকস্মিকভাবে হিন্দু ও মুসলিম—এই দুই ধর্মীয় পরিচয়ের

মানুষের অস্তিত্বসংকট তৈরি হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভূত বাস্তবতায় পশ্চিমবঙ্গ-আসামের মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের অনেককেই পূর্ববঙ্গ অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশে এবং এখানকার অনেক হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের ভারতে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয়গ্রহণ করতে হয়। 'একটি তুলসীগাছের কাহিনী' গল্পের পটভূমি দ্বিজাতি তত্ত্বের পটভূমিতে সংঘটিত ১৯৪৭ সালের দেশভাগ, আরো নির্দিষ্টভাবে বলা যায় দেশভাগের ফলে সৃষ্ট শরণার্থী সংকট। কলকাতাসহ ভারতের অন্যান্য স্থান থেকে যাদেরকে নিরাপদ আশ্রয়ের আশায় এদেশে পাড়ি জমাতে হয়েছিল, এই গল্পের চরিত্ররা তাদেরই প্রতিনিধিস্বরূপ। মতিন, কাদের, বদরুদ্দিন, মোদাব্বের, মকসুদ, ইউনুস—এরা সবাই শরণার্থী। শঙ্কিত, গৃহহীন ও সদ্য দেশহীন জনগোষ্ঠীর একাংশের এই গল্পে একটি পরিত্যক্ত বাড়িতে আশ্রিত হবার ঘটনা এবং তাদের নানাবিধ স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গ, সম্পর্কের হৃদ্যতা ও তিক্ততা, মতের ঐক্য ও অনৈক্যসহ সহাবস্থানগত ব্যাক্তিক-মনস্তাত্ত্বিক-রাষ্ট্রিক সংকট এই গল্পে উপস্থাপিত হয়েছে। এই অঞ্চলের মানুষের একটি বড় অংশের ডায়াসপোরা হয়ে ওঠার বা হয়ে যাবার সময় ছিল এটি। বিশেষ পরিস্থিতিতে বাস্তুচ্যুত বা বাস্তুত্যাগী মানুষ হিসেবে ডায়াসপোরা জনগোষ্ঠী প্রথমেই সন্ধান করে নিরাপদ আশ্রয় তথা গৃহের। এই গল্পে দেখা যায়–

> ...দেশভাগের হুজুগে এ শহরে এসে তারা যেমন-তেমন একটা ডেরার সন্ধানে উদয়াস্ত ঘুরছে, তখন একদিন দেখতে পায় বাড়িটা। সদর দরজায় মস্ত তালা, কিন্তু সামান্য পর্যবেক্ষণের পর বুঝতে পারে বাড়িতে জনমানব নাই এবং তার মালিক পলাতক। পরিত্যক্ত বাড়ি চিনতে দেরি হয় না। কিন্তু এমন বাড়ি পাওয়া নিতান্ত সৌভাগ্যের কথা।...সে-দিন সন্ধ্যায় তারা সদলবলে এসে দরজার তালা ভেঙ্গে রৈ-রৈ আওয়াজ তুলে বাড়িটায় প্রবেশ করে। তাদের মধ্যে তখন বৈশাখের আম কুড়ানো ক্ষিপ্র উন্মাদনা বলে ব্যাপারটা তাদের কাছে দিন দুপুরে ডাকাতির মতো মনে হয় না।...পরদিন শহরে খবরটা ছড়িয়ে পড়লে অনাথিতদের আগমন শুরু হয়। মাথার ওপর একটা ছাদ পাবার আশায় তারা দলে দলে আসে।[৮]

একটি ভূখণ্ডের দীর্ঘবাসের স্মৃতি-সংস্কৃতি-আচার-অভ্যাসের সঙ্গে নতুন বসতির সংস্কৃতি-আদবের দূরত্ব ডায়াসপোরা জনগোষ্ঠীকে অনুভব করতে হয়, মানিয়ে নিতে হয়। এই গল্পের চরিত্রদেরকেও তা করতে হয়। তাদের মধ্যে নস্টালজিয়া থাকে; যেমন, এই গল্পের সাবেক রেলওয়েকর্মী মতিনের মধ্যে রয়েছে। এই গল্পে বিশেষ পরিস্থিতিতে পুলিশের একাধিকবার আগমন ও আইনি বিধি প্রতিপালন কিংবা সরকারি আদেশ জ্ঞাতকরণের মাধ্যমে ডায়াসপোরা জনগোষ্ঠীকে নতুন আইন-কানুন ও এ-সংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হতে হয়েছে, পৃথিবীব্যাপ্ত প্রায় সব ডায়াসপোরিককেই আশ্রিত দেশের সমধর্মী বা ভিন্নধর্মী আইন-কানুনের সঙ্গে নিজেদের অভ্যস্ত করা বা সংকটসহ কিংবা সংকটহীনভাবে এসব মোকাবিলা করার অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হয়। এই গল্পটি রাজনৈতিক বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে গল্পকারের পরোক্ষ অভিজ্ঞতাজাত। তবে এরও আগে বাস্তুহীন মানুষের অন্তর্দহন, নৈঃসঙ্গ্য ও গৃহকাতরতার কথা গল্পকার বলেছিলেন তাঁর *নয়নচারা* গ্রন্থের 'জাহাজী' গল্পে।

'জাহাজী' গল্পটি মূলত করিম সারেঙ-এর গল্প। গল্পে তার চিন্তা ও অনুভবের বয়ানের সঙ্গে জুড়েছে ছাত্তারের গল্পও। পেশাগত কারণে ডায়াসপোরা বর্গে যে জনগোষ্ঠীকে রাখা হয়, সারেঙ করিম সেই গোত্রের। ডায়াসপোরিক বা দীর্ঘ বছর স্বগৃহচ্যুত হিসেবে তার পরিণতি চরম নৈঃসঙ্গ্য। সারেঙ

জীবনের চক্র থেকে এখন সে চাইলেও বেরিয়ে আসতে অপারগ : 'এ জীবন ছেড়ে কোথায় সে যাবে? দেশে আপনার বলতে কেউ নেই : সেখানে মমতাশূন্য শুষ্কতা। আত্মীয় যারা আছে তারা নামে আত্মীয়, দীর্ঘ বিচ্ছেদের জন্যে তার জীবনের সঙ্গে তাদের কোনো সংযোগ নেই।'[৯] অনাত্মীয়, বন্ধনহীন ও নিঃসঙ্গতায় আড়ষ্ট করিম সারেঙ তাই কোনো তীরে জাহাজ নোঙর ফেললে ভীত হয়ে ওঠে। কারণ স্বগৃহেই সে পরবাসী। তার এই জীবনের কারুণ্য তাকে ব্যথিত করে। অপরদিকে জাহাজের মাল ওঠানামা করার কর্মী ছাত্তারের সবই আছে—গৃহ আছে, স্থায়ী ঠিকানা ও আত্মীয় আছে। এমনকি ছাত্তার জাহাজের গৃহহীন অনাত্মীয় পরিবেশে নিজেকে পুরোপুরি খাপ খাওয়াতেও পারেনি। তাই কর্মপরিবেশে প্রায়শই লাঞ্ছনার শিকার হওয়া ছাত্তারদের জাহাজ যখন তীরে নোঙর ফেলে, করিম তাকে বলে–'তুই বারিৎ যা গই, আর ন আইছ।'[১০] করিমের ভেতরের মানবিকতা ও স্নেহার্দ্রতা তার মতো পরিণতির জীবন আর কারো জন্য প্রত্যাশা করে না। তাই ছাত্তারকে ডায়াসপোরা জীবনের গ্লানি থেকে বের হতে অনুপ্রাণিত করে, নির্দেশনা দেয়।

পাঁচ

'জাহাজী' গল্পের ছাত্তারকে গল্পের শেষাংশে জাহাজি জীবনের শৃঙ্খল থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত হিসেবে দেখা যায়। বর্তমান প্রবন্ধের অন্যতম আলোচ্য গল্প 'না কান্দে বুবু'র প্রধান চরিত্র আফতাবউদ্দিনও কর্মসূত্রে ডায়াসপোরা গোত্রের মানুষ। গল্পের শুরুতেই তাকে কর্মস্থল থেকে দীর্ঘদিন পর স্বগৃহে যাত্রারত অবস্থায় আবিষ্কার করা যায়। আফতাবের এই যাত্রায় সে— 'বাস্তবতায় অতিক্রম করেছিল যে-পথটুকু, তার মানস-পরিভ্রমণ ছিল সে তুলনায় অনেক অনেক বেশি বিস্তৃত'[১১] কারণ এই গল্পে যে যাত্রাপথটি রয়েছে সেটি 'সোনাকান্দি' থেকে 'মাঝের হাট' পর্যন্ত। আর গল্পের 'সমস্তটাই ঘটেছে আফতাব মিঞার মানসলোকে, কেবল গল্পের শেষাংশ বাস্তবভাবে সংঘটিত।'[১২] একটি যাত্রার মধ্যে সীমায়িত এই গল্পের পরিসর। গল্প থেকে জানা যায় শেখ আফতাবউদ্দিন শহরে চাকরি করে। আর চাকরির অবসর সময়ে করে বই বাঁধানোর কাজ। চার বছর পর সে গ্রামে ফিরছে। গ্রামে আছে তার জন্য অপেক্ষারত বৃদ্ধ পিতা নুনা মিঞা, আর বুবু অছিমন। সে বৃদ্ধ পিতা ও বোনের জন্য লুঙ্গি-শাড়ি উপহারসহ বাড়ি আসছে নৌপথে। গল্পের পাঠে জানা যায় আফতাবউদ্দিনের বুবু অছিমন সুখেও কাঁদে, দুঃখেও কাঁদে। বুবুর জোয়ান স্বামীর হঠাৎ মৃত্যুর পর এবার প্রথম তার বুবুর সঙ্গে দেখা হবে। দেখা হয়। কিন্তু 'যে বুবু কাঁদত, সুখেও কাঁদত দুঃখেও কাঁদত, সে বুবু কাঁদে না।'[১৩]—ঘটনা ঘনঘটাহীন, নদীর মতোই মন্থর বয়ে গেছে কাহিনি, মন্থর ক্লান্ত একটি অনিবার্যতায়।[১৪] শ্লথগতির এই গল্পে আফতাবউদ্দিনের মায়াবী বুবুর ক্রন্দনহীনে পরিণত হবার সঙ্গে সঙ্গে আফতাবউদ্দিনের কর্ম, কর্মস্থল, সহকর্মীদের পরিচয় ও অবস্থা; আত্মীয়-প্রতিবেশী, পিতা ও পরিবারের অপরাপর সদস্যের চাওয়া-পাওয়া ও প্রত্যাশা এবং প্রত্যাশাহীন হবার সংক্ষিপ্ত, অনুভববেদ্য ও কাব্যিক উপস্থাপন রয়েছে। আর এই সার্বিক পরিস্থিতির সঙ্গে রয়েছে ডায়াসপোরা প্রসঙ্গের গভীর যোগাযোগ। আফতাবউদ্দিন চরিত্রের মগ্ন অন্তঃস্রোতে ক্লান্তি ও ক্লান্তিহীনতায় তার আপাত স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনের সংঘাত-সংকট যেভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, তাতে ডায়াসপোরা ন্যারেটিভ মূর্ততা লাভ করেছে। নৌপথে গোটা একদিন লাগে যে বাড়ি যেতে, আফতাব তার সেই

বাড়িতে যাচ্ছে চার বছর পর। তার সম্পর্কে পরিপার্শ্বের মানুষের ধারণা ও তথ্য প্রদান করা হচ্ছে গল্পে :

> আফতাব মিঞা দ্যাশে থাকে না, দ্যাশে আসে না। আফতাব মিঞা চাইর বচ্ছর দ্যাশে থাকে না, দ্যাশে আসে না। শহরে থাকে। হেই বড় শহরে। আফতাব মিঞা গাড়ি-ঘোড়ায় চলে। আফতাব মিঞা সিদ্ধভাত খায়, বরফের মাছ খায়। আফতাব মিঞা রঙে আছে।
>
> খেদু মিঞা দাঁতের মাজন বিক্রি করে ঢং করে বক্তৃতা দিয়ে, হাত সাফাইয়ের ম্যাজিক দেখিয়ে। খেদু মিঞা সে-শহরের খবর রাখে। আফতাব মিঞা হেই শহরে থাকে। চার বচ্ছর আফতাব মিঞা দ্যাশে থাকে না, দ্যাশে আসে না।
>
> —শহরে থাইকা আফতাব মিঞা বাড়িৎ কেবল টেকা পাঠায়।[১৫]

পরিপার্শ্বের মানুষ বা গ্রামবাসীর বয়ানে আফতাব মিঞার 'রঙে থাকা' বা সুখে থাকার বৃত্তান্ত এখানে আছে। আছে শহরে থেকে গ্রামের বাড়িতে টাকা পাঠানোর তথ্য। আর গ্রামবাসীদের এসব তথ্যের যোগানদাতা দাঁতের মাজন বিক্রেতা খেদু মিঞা। অর্থাৎ মুখে মুখে রটিত আফতাবের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথা। তাদের বয়ানে আরো জানা যায়—আফতাব কাবেল ছেলে। চাকরি করে আর বই বাঁধানোর দোকান চালায়। তাই সে দেশে আসতে পারে না। এদিকে মানিঅর্ডারে আফতাব যে টাকা পাঠায় তার পিতার কাছে টাকার প্রয়োজন আরও বেশি। তার-'আরো টাকা চাই। জমি বন্ধক হল, মান-সম্মান গেল। ও টাকায় হবে না, আরো চাই।' কিন্তু স্বগৃহ থেকে দূরে বসবাসকারী ছেলে এই চাহিদার যোগান দিতে অপারগ। পত্রে পিতাকে জানায় :

> দোয়া-সালাম পর আরজ এই যে, ব্যবসা চলিতেছে না, বাকি দেনা অনেক। বন্ধকী জমি ছাড়াইবার মতো টাকা হাতে নাই।...বলে, দোয়া-সালাম পর আরজ এই যে, আপিসের ছুটির সময় বই-বান্ধানীর কারবার দেখিতে হইবে, নচেৎ বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা আছে।[১৬]

পুত্রের অপারগতার কথা জেনে বৃদ্ধ পিতা রাগ করে। উপরন্তু ছয় ছেলে-মেয়ে রেখে হঠাৎ মৃত্যুবরণ করেছে আফতাবের দুলাভাই। নুনা মিঞাকে তাদেরকেও দেখতে হয়। ছেলে কম টাকা পাঠানোয় তাই সে রেগে যায়, ছেলের অবস্থা বুঝতে চায় না। প্রবাসী তথা কর্মসূত্রে ডায়াসপোরা জনগোষ্ঠীকে এমন সংকট প্রতিনিয়তই মোকাবিলা করতে হয়। তাদের পরিবার পরিজন, আত্মীয়-অনাত্মীয় সবাই মনে করে সে খুব ভালো আছে, অথচ প্রকৃত সত্য এটা যে, 'আফতাব মিঞার পেটে জোর নেই সিদ্ধভাত খেয়ে। একটু নুন, একটু মরিচ, একটু মাছ। গাড়ি-ঘোড়ায় চড়ে না। সে রঙে নাই। রনকদার শহরে রঙে নাই।'[১৭] অর্থাৎ রনকদার শহরের রঙ-বিলাসিতা আফতাবউদ্দিনকে স্পর্শ করে না—সে খাটে দিনরাত পরিবারের জন্য। তার মন চঞ্চল হয় পিতা-বুবু-মায়ের কবর, আত্মীয় পরিজন আর গাঁয়ের পরিবেশের জন্য।—

> আফতাব ভাবে চার বছর। চার বছর পরে বাড়ি যাচ্ছে। কলাপাতা ঘেরা আম-জাম-গাছের ধারে, খাল-বিল, নালা-ডোবার পাশে শতসহস্র ঘনবসতির মধ্যে বসবাস-করা লোকদের জন্য চার বছর পরে বাড়ি যাওয়াটা বড় কথা। সে-কথা পুঁথির কাহিনীর মতো দেশময় ছড়িয়ে পড়বার মতো অসাধারণ, নাড়ি ছেঁড়ার মতো গায়র-মামুলি।[১৮]

অনাত্মীয় দীর্ঘ ডায়াসপোরিক আফতাবের মন বুবুর আদর-আপ্যায়ন পাবার আশায় কাতর হয়। অনতিবিলম্বে যাত্রাশেষে বাড়ি ফিরতেই তাকে কেন্দ্র করে বুবুর সম্ভাব্য কর্মযজ্ঞ সম্পর্কে সে ভাবিত হয়:

> আমার ভাই দ্যাশে ফিরছে। আমার কলিজার ভাইটা গো দ্যাশে ফিরছে। বুবু কাঁদবে, তারপর হাসবে। স্বামীর দুঃখ ভুলবে, পুকুরের মাছের দুঃখ আর আমের দুঃখ ভুলবে।
> বুবু পিঠা তৈরি করবে নানান রকমের। শহরে-থাকা ভাইটার কী খেতে শখ করে? চিতল পিঠা? কেড়া পিঠা, হাতাই পিঠা?[১৯]

আফতাব মিয়ার গৃহযাত্রা পূর্ণতা পায়। কিন্তু এই যাত্রাময় ভাবিত তার কোনো ইচ্ছে-কল্পনাই পূর্ণতা লাভ করে না। সে দেখতে পায় তার বাবা নুনা মিঞার রাগ নেই। তার চোখে ছানি। এই ছানির জন্য পুত্র আফতাবকে সে দেখতেও পায় না স্পষ্টভাবে। আর ভাইয়ের উপস্থিতিতে তার বুবু অছিমন চঞ্চল হয়ে ওঠে না, থ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। আর তার—

> বুবু কাঁদে না। বুবু গোয়াল ঘরে কাঁদে না, চুলার আগুনের পাশে কাঁদে না, ঘাটে কাঁদে না। তেজ নাই চলনে-বলনে, বুবু কাঁদেও না। সোনা ভাইটা দেশে ফিরেছে, বুবু কাঁদে না। শাড়ি দেখে বুবু। বুবু শাড়ি দেখে, কাঁদে না। বুবু নীরবে শাড়ির জমিন দেখে হাত নিচে রেখে, বুবু কাঁদে না।[২০]

আফতাবের যে বুবু সুখে-দুঃখে কাঁদতো, তার ক্রন্দনহীন হয়ে পড়ার মধ্যে সপ্রাণ এক নারী তথা মানুষের নিষ্প্রাণ হবার ইতিবৃত্ত নিহিত। উদয়াস্ত পরিশ্রম করা আফতাবের কাঙ্ক্ষিত প্রাণময় পরিবারের এমন নিস্তেজ হয়ে পড়ার ভেতর তার অব্যক্ত বেদনার এক পটভূমি সৃষ্টি হয়—বুবুর কান্নাহীন হবার চিত্রায়ণের বিপরীতে আফতাবের অনুরূপ অনুভূতি সঞ্চারের অনুল্লেখিত পট সেটি। আর এভাবেই ডায়াসপোরা জনগোষ্ঠীর জীবন পরিবারহীন দীর্ঘবাসের পর পূর্বের অবস্থা থেকে পরিবর্তিত হয়ে যায়। তাদের পরিশ্রমসাধ্য কঠিন জীবনসংগ্রামের উৎস ও প্রেরণা ফিকে ও ম্লান হয়ে যায়। এই গল্প তাই কর্মসূত্রে ডায়াসপোরা জনগোষ্ঠীর প্রাত্যহিকতা ও পরিণামের বিশ্বস্ত বয়ান।

ছয়

বর্তমান প্রবন্ধের চার সংখ্যক অনুচ্ছেদে ব্যবহৃত একটি উদ্ধৃতিতে লেখকের ইংরেজি ভাষায় লেখার আগ্রহ ও কারণ জানা গিয়েছিল। এর ফলাফলস্বরূপ পরবর্তীতে পাঠকের হস্তগত হয়েছে *দ্য আগলি এশিয়ান* (*কদর্য এশীয় ২০০৬*) ও *হাউ ডাজ ওয়ান কুক বিন্‌স (শিম কীভাবে রান্না করতে হয় ২০১২)* উপন্যাসদ্বয়। দুটি উপন্যাসই সমালোচক কর্তৃক উত্তর-ঔপনিবেশিক চেতনাবাহিত টেক্সট হিসেবে সাব্যস্ত হয়েছে।[২১] আবু শরিয়া ছদ্মনামে ঔপন্যাসিক এই দুটি টেক্সট রচনা করেছিলেন। দুটি টেক্সটেই তিনি এশীয় হিসেবে পশ্চিমা বিশ্বকে অবলোকন করেছেন—পশ্চিমের দৃষ্টিতে প্রাচ্য এবং প্রাচ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে পশ্চিমকে দেখার প্রয়াস পেয়েছেন। তবে বর্তমান বিবেচ্য অর্থাৎ ডায়াসপোরা প্রসঙ্গে *শিম কীভাবে রান্না করতে হয়* উপন্যাসটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই উপন্যাসের উপ-শিরোনাম 'এক এশীয়র ফ্রান্স-অভিযান'। এশীয় ও ফরাসির জাতিগত চারিত্র্য, তাদের সাংস্কৃতিক দূরত্ব নির্দেশে লেখকের বয়ানের আশ্রয় হয়েছে তীব্র স্যাটায়ার। অকিঞ্চিৎকর একটি সবজি অর্থাৎ শিম রান্নার নিখুঁত কৌশল তথা ব্যাপকার্থে তথাকথিত সাংস্কৃতিক উৎকৃষ্টতার অধিগ্রহণে এই স্যাটায়ারের সূচনা। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন, ১৯৬১ সাল থেকে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসের পাকিস্তান দূতাবাসে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ফার্স্ট সেক্রেটারি পদমর্যাদায় যোগদান

করেন এবং ফরাসি কন্যা আন মারিকে বিয়ে করে সেখানেই সংসার পাতেন। ১৯৭১ সালে ফ্রান্সেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। অর্থাৎ কর্মসূত্রে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ছিলেন ডায়াসপোরা জনগোষ্ঠীরই একজন। একজন বাঙালি তথা এশীয় হিসেবে ফ্রান্স তথা ইউরোপীয় সংস্কৃতির সঙ্গে তাঁকে এক দশকব্যাপী নিজেকে অভিযোজিত করতে হয়েছে। আর ডায়াসপোরা জনগোষ্ঠীর যাপনে এই নতুন সংস্কৃতিতে অভিযোজন করার চ্যালেঞ্জ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, ইয়োরোপীয় সংস্কৃতির সঙ্গে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র অভিযোজনগত সংকটের সাহিত্যগত বয়ান এই উপন্যাস। *আমার স্বামী ওয়ালী* গ্রন্থে আলোচ্য উপন্যাস রচনার পেছনে একটি উদ্দীপক-ঘটনার উল্লেখ রয়েছে :

> এই প্রহসন *(শিম কীভাবে রান্না করতে হয়)* লেখার আইডিয়া ও (ওয়ালীউল্লাহ্) পেয়েছিল ম্যানিলার এক রেস্তোরাঁয় খেতে গিয়ে। সেখানে এক শোরগোলকারী ফরাসি নাগরিক তাকে পরিবেশন করা শিমের ব্যাপারে অভিযোগ তুলে বলেছিল, এগুলোর রান্না করার তরিকা ঠিক হয়নি।[২২]

শিল্পনগরী হিসেবে প্যারিসের হাতছানি যেকোনো শিল্পীসত্তার জন্য এড়ানো অসম্ভব। *শিম কীভাবে রান্না করতে হয়* উপন্যাসের শুরুর দিকে ঔপন্যাসিকের বয়ানও এমনটিই দেখা যায় :

> ...ফ্রান্সের হাতছানি এতই অপ্রতিরোধ্য। শুরুতে এই বাসনা অবশ্য বিদ্যমান থাকে এক আকারহীন ব্যাখ্যাতীত ইচ্ছা হয়ে; কেননা, কেউ জানে না ফ্রান্সে গিয়ে তারা আসলে কী দেখতে চায়, কিংবা কেন এ দেশে আসার জন্য তাদের মন পুড়ছে! কিন্তু ধীরে ধীরে এই নিরাকার বাসনা একটা অর্থ, একটা যৌক্তিকতা লাভ করে। কেউ কেউ ফ্রান্সে যেতে চায় ফ্রান্সের সভ্যতা-সংস্কৃতি দেখতে, কেউ যেতে চায় সরল অথচ জটিল ফরাসিদের দেখতে।[২৩]

ব্যক্তি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র মনোভাব এখানে কথকের মুখে বর্ণিত হয়েছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। যদিও এই উপন্যাসের এশীয় কথক ফ্রান্স ভ্রমণের পেছনে কথিত একশ একটি কারণের কোনোটির জন্য ভ্রমণ করেননি—তিনি ভ্রমণ করেছেন ফরাসিদের নিখুঁত ফ্রেঞ্চ শিম রান্নার কৌশল রপ্ত করতে মূলত। আর এখানেই গুরুতর একটি বিষয়কে অপেক্ষাকৃত লঘু হিসেবে উপস্থাপনের কৌশলের সূত্রপাত। অবশ্য ফ্রান্সের নানা বিষয়ে কথকের কৌতূহল বিদ্যমান এটি জানাতে তিনি ভোলেননি। এশিয়ার এক আলিশান হোটেলে অঁদ্রে পেরর‍্যাঁ নামক এক ফরাসি ভদ্রলোক যখন সেখানকার শেফকে শিম রান্নার কৌশল বলে দিচ্ছিল, তখন পূর্ব থেকে ফরাসি নানা বিষয়ে আকৃষ্ট কথক মূলত এই নিখুঁত শিম রান্নার কৌশল জেনে ও দেখে আকৃষ্ট হয় এবং সে দেশে যাবার আকাঙ্ক্ষা তার তীব্র হয়ে ওঠে। উপন্যাসের সংখ্যাচিহ্নহীন তৃতীয় পরিচ্ছেদে এশীয় কথককে ফ্রান্সে যাবার পূর্ব-সতর্কতা অবলম্বনের কথা বলতে শোনা যায়। তার ভাষ্য—

> আমি সাবধানী মানুষ। বলতে কি, এশিয়ার সব লোকই সাবধানী, এমনকি সর্বগ্রাসী বাসনার আগুনে পোড়ার সময়ও তারা সাবধানী। সাবধানী হওয়াই তাদের পক্ষে স্বাভাবিক, নতুবা বিদেশিদের শত শত বছরের লুটপাট আর হামলা, প্রকৃতির খামখেয়ালিমার্কা নিষ্ঠুরতার পরও কি তাদের পক্ষে এভাবে টিকে থাকা সম্ভব হতো?[২৪]

—স্যাটায়ারের মাধ্যমে আত্মপরিচয় উদ্‌ঘাটনের এই কৌশল গুরুতর হলেও কথকের উপস্থাপনভঙ্গি একে নৈর্ব্যক্তিক করে তোলে। অর্থাৎ লেখকের স্বজাতির স্বভাব ও নিয়তির সংক্ষিপ্ত অথচ সুদীর্ঘ বঞ্চনার বয়ন এটি—তা লেখকের কিংবা কথকের হয়েও সব এশীয়র। লেখকের

পূর্ববর্তী ত্রয়ী উপন্যাসের কেন্দ্রস্থ দর্শন ছিল অস্তিত্ববাদ। এই উপন্যাসেও এর ছাপ স্পষ্টতা পায় ফরাসি লোকটার সঙ্গে কথকের দেখা করার পর তার ভেতর জেগে ওঠা পরিবর্তনসমূহে তথা তার অস্তিত্ব আবিষ্কারে—এই আবিষ্কার জাতিগত, ভৌগোলিক এবং বিশেষভাবে সাংস্কৃতিক :

> আমি এশীয় বটে, তবে সব সময় নই। একজন এশীয় যতক্ষণ এশিয়ায় অবস্থান করেন, ততক্ষণ তিনি এশীয় নন। ঠিক যেমনটা ফ্রান্সে অবস্থানকালে একজন ফরাসি নন। একজন এশীয় এশীয় হয়ে ওঠেন একজন এশিয়া-বহির্ভূতের সাক্ষাৎ পেলে, ঠিক যেমন করে অফরাসির দেখা পেলে একজন ফরাসি ফরাসি হয়ে ওঠেন।[২৫]

এখানে কেবল এশীয়র অস্তিত্ব আবিষ্কার করা হয়নি, স্থান-পাত্র ভেদে ফরাসির অস্তিত্বও নির্ধারণ করা হয়েছে। ডায়াসপোরা তত্ত্বে সাংস্কৃতিক অভিযোজনে এমন চিহ্নায়ন বা নির্ধারণ অবশ্যম্ভাবী। ওয়ালীউল্লাহ্‌র অভিজ্ঞতা-নিঙড়ানো এমন সত্য আবিষ্কারের দৃষ্টান্ত এই উপন্যাসে আরো মেলে। যেমন, এশিয়া ভ্রমণাগত 'সার্বক্ষণিকভাবে অসুখী' বলে প্রতীয়মান অঁদ্রে পেররঁ্যার অসুখীভাব প্রসঙ্গে কথকের বয়ান- '...আমার জানা ছিল না যে, ফরাসিরা ছাড়া ব্রিটিশ বা অন্য কেউ দীর্ঘদিন শাসন করে গেছে এবং সর্বত্র তাদের পদচিহ্ন রেখে গেছে, এমন কোনো দেশে এসে খুব কম ফরাসিই সুখ বোধ করতে পারে।'[২৬] এশীয়র প্রতি ফরাসিদের আচরণ এবং এর কার্যকারণ অনুসন্ধানের বাস্তবসম্মত অভিজ্ঞতা না থাকলে কথকের এমন বয়ান পাওয়া যেতো না। কারণ উপনিবেশিতদের প্রতি ঔপনিবেশিক শক্তি—তা হোক প্রাক্তন—তার যে ক্ষমতাপ্রদর্শনগত আত্মতৃপ্তি থাকে, প্রকারে সাম্রাজ্যবাদী হয়েও সেই আত্মতৃপ্তি এই ফরাসি খুঁজে পাচ্ছে না তার পূর্বসূরিদের ক্ষমতার ছায়া এখানে ছিল না বলে। সাম্রাজ্যবাদ ও সাম্রাজ্যবাদীদের এমন খোলশহীন সত্য মানবচরিত্র তথা ক্ষমতাবানদের চরিত্র গভীরভাবে পর্যবেক্ষণজাত বিষয়—যা এশিয়া-উদ্‌গত ফরাসি ডায়াসপোরা বাঙালি লেখক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ অনুধাবন করেছিলেন। এশিয়া ও ফ্রান্সের মানুষের আচরণের ভিন্নতা, তাদের মধ্যকার সাংস্কৃতিক ভিন্নতা তথা দূরত্ব বুঝতে সহায়ক হবে এই উপন্যাসের কয়েকটি বর্ণনা ও মন্তব্য বিশ্লেষণ। প্রথমে এশীয় প্রসঙ্গ :

১ আমি ফিসফিস করে তাকে ধন্যবাদ দিলাম। তারপর সন্তর্পণে হেঁটে ঢুকে পড়লাম আমার কাছে প্রতিভাত প্রাচ্যের রহস্যময় অন্ধকারের ভেতর। অবাক হয়ে লক্ষ করলাম, সুবিশাল ফাঁকা লবির শক্ত মর্মর মেঝেতেও আমার জুতা কোনো আওয়াজ তুলছে না। এশীয়রা এভাবেই হাঁটে।[২৭]

২ কেউ স্টুপিড বলবে, এশীয়রা ব্যাপারটা মোটেই হজম কতে পারে না। ...এশীয়রা আর যে একটা জিনিস হজম করতে পারে না, সেটা হলো কাপুরুষ উপাধি।[২৮]

৩ ডাক্তার যতবারই আমার দেহের উপর হাত রেখেছেন, আমি একটা ছোট পশুর মতো যন্ত্রণায় মোচড়ামুচড়ি করে উঠেছি। সেটা করেছি ডাক্তারকে হতাশ করতে চাইনি বলে। প্রত্যেক এশীয়ই অপরের জন্য এই দায়িত্বটি বোধ না করে পারে না।[২৯]

এবার ফরাসি প্রসঙ্গ :

১ ...কণ্ঠস্বরটার (অঁদ্রে পেররঁ্যার) মধ্যে মাননীয় একটা ব্যাপার ছিল, কেমন সহজ অথচ কর্তৃত্বসূচক একটা ব্যাপার, ঝরনাধারার মতো অনায়াস অথচ আদেশমূলক।[৩০]

২ ...কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ে নেওয়ার পর তৎক্ষণাৎ সেটা করে ফেলায় তিনি বিশ্বাস করেন। কেননা, যে আকস্মিকতায় তিনি পানি ছেড়ে উঠে এলেন, তাতে যে-কারো মনে হবে, ভয়ংকর কোনো সমুদ্র-দানব

তাঁকে তাড়া করেছে। হুড়মুড় করে পানি ভেঙে তিনি বালুময় সৈকতের দিকে ছুটলেন, গায়ে একটা সুতোও নাই। উঠে তাঁর তাঁবুতে রাখা জামাকাপড়ের দিকে ছুটলেন। সৈকতে একটা অশুভ নিস্তব্ধতা নেমে এল, তারপর মেয়েদের আর্তচিৎকার আর পুরুষদের ক্ষুব্ধ তর্জন। তবে এসব হই-হট্টগোলের প্রতি আমার বন্ধুর কোনো মনোযোগ নাই।[৩১]

৩ ...আগে আপনাকে প্যারিসের বাতাসে অভ্যস্ত হতে হবে। যৎসামান্য প্রশিক্ষণ ছাড়া কোনো বিদেশিকে প্যারিসে ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়।...প্যারিসের উন্মাদ ও বিশৃঙ্খল যানবাহনের মধ্যে থেকে বিদেশিরা যাতে শিহরণ বোধ করতে পারে সে জন্য আমরা প্রশিক্ষণ দিই, মিথটা যদি আমরা জারি করে না রাখি, বিদেশিদের মজা তাহলে নষ্ট হয়ে যাবে। তাদের পয়সা উসুল হবে না।[৩২]

উদ্ধৃতি ১-এ কথিত 'প্রাচ্যের রহস্যময় অন্ধকার' বলতে বোঝাচ্ছে এশিয়ার ইতিহাস, চেতনা ও জনচরিত্রের অনুন্মোচিত অধ্যায়। সচেতন লেখক এই রহস্য ভেদকারী বিধায়, তিনি জানেন এশীয়দের আওয়াজহীন হাঁটার ধরন, তাদের কুণ্ঠিত অথচ সতর্ক পদক্ষেপ। উদ্ধৃতি-২-এও এশীয় চরিত্রের গালি গ্রহণের দুর্বলতার কথা বলা হয়েছে। ৩-সংখ্যক উদ্ধৃতিতে এশীয়দের মেকি আচরণের বিষয়ে লেখক বলেছেন—আর এখানে তিনি স্যাটায়ারের আশ্রয় নিয়ে নিজেকে উপলক্ষ্য করে স্বজাতির স্বরূপ তুলে ধরেছেন। বস্তুত প্রতিটি উদ্ধৃতিতেই লেখকের এশীয় চরিত্র উপস্থাপনে একটি সাপেক্ষ ভাব ক্রীয়মাণ। এই সাপেক্ষতা অএশীয় এবং মূলত ইয়োরোপীয়দের আচরণের ধরন ও প্রেক্ষাপটের কাউন্টার ন্যারেটিভ। ফরাসি পর্যটক অঁদ্রে পেররঁ্যা ও কথকের ফরাসি ভ্রমণ গাইডের আচরণ ও বক্তব্যও অনুরূপভাবে এশীয়দের আচরণের বিপরীত দিকের প্রতিফলনকারী। যেমন, উদ্ধৃতি-৪-এ অঁদ্রে পেররঁ্যার কণ্ঠস্বরের 'মাননীয়' ও 'কর্তৃত্বসূচক' ব্যাপার ও সহজাত আদেশমূলক এশীয়দের উদ্দেশে, তাদের প্রতি। এটা ফরাসিদের আত্মগত এবং তাদের দীর্ঘ সাম্রাজ্যবাদী ইতিহাসের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত আচরণ। আর উপনিবেশিত হিসেবে এশীয়র পদসঞ্চালন যেভাবে নিঃশব্দ ও আওয়াজহীন (উদ্ধৃতি-১)। ৫ সংখ্যক উদ্ধৃতিতে এশীয় সংস্কৃতিকে তোয়াক্কা না করে ফরাসি অঁদ্রে পেররঁ্যার সমুদ্রস্নানে সমস্ত পরিধেয় ভেসে যাবার পর দিগম্বররূপে জনসমক্ষে উঠে আসা ও নির্বিকারভাবে তাঁবুর দিকে যাত্রার কথা বলা হয়েছে। এর ফলে সৈকতে সৃষ্ট 'অশুভ নিস্তব্ধতা', বিব্রত 'নারীদের আর্তচিৎকার', আর ক্ষুব্ধ পুরুষদের তর্জনের বর্ণনা রয়েছে। তবে এরও আগে দিগম্বর অবস্থাতেই সৈকতে উঠে আসার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গেলে পেররঁ্যা যে তৎক্ষণাৎ সেটা করে ফেলল—এটা ফরাসিদের কর্মপন্থা। আর এর বিপরীত কর্মপন্থা এশীয়র। উপন্যাসপাঠে তৃতীয় পরিচ্ছেদে এশীয় কথক যখন ফ্রান্সে যাবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, তৎক্ষণাৎ সে তা বাস্তবায়নে উদ্যমী হয়নি। সে ছিল সাবধানী ও এ-বিষয়ে গভীরভাবে ভাবিত। এভাবে এশীয়-ফরাসির ভাবনা-আচরণ ও চৈতন্যগত ভিন্নতা এই উপন্যাসের পৃষ্ঠাসমূহ ধারণ করেছে। আর এই উভয় সংস্কৃতির ভিন্নতা ও দূরত্ব ডায়াসপোরা জীবনে লেখকের অভিজ্ঞতা-অবলোকনেরই রূপায়ণ, তা বলা যায়। আবার সর্বশেষ অর্থাৎ ৬-সংখ্যক উদ্ধৃতিতে একজন বহিরাগতকে ফ্রান্সে গিয়ে কীভাবে ও কেন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে, অভ্যস্ত হতে হবে, শিখতে হবে এবং তা মান্যও করতে হবে—এর সংক্ষিপ্ত অথচ গূঢ়ার্থবাহী প্রকাশ রয়েছে কথকের ভ্রমণ-গাইডের বিচ্ছিন্ন বক্তব্যে। উদ্ধৃতির সর্বশেষ লাইনে 'পয়সা উসুল' করে দেবার ব্যবসায়িক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্ষমতাধর রাষ্ট্রের বেনিয়া-চরিত্রের দিকটি উন্মোচিত হয়। এশিয়ায় এসে ফরাসি পর্যটককে এসব শিখতে, বুঝতে, মানতে প্রশিক্ষণ

গ্রহণ ও রক্ষার দায় ছিল না। উপরন্তু এখানকার রন্ধন-সাংস্কৃতিকে সে অবজ্ঞাভরে প্রত্যাখ্যান করে নিজের বা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বজ্ঞান করা রন্ধনশৈলী শিখিয়েছে, চাপিয়ে দিয়েছে। দীর্ঘকাল উপনিবেশিতের মন ঔপনিবেশিক আচরণ ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রশ্নহীনভাবে স্বীকার করে। তাই শেফ গ্রহণ করেছে পেররঁ্যর রন্ধনপ্রণালি, আর কথক তাতে মুগ্ধ হয়ে যাত্রা করেছে পেররঁ্যার দেশে। অপরদিকে এশীয় কথককে ফরাসিরা তাদের রীতি-নীতি তথা সিস্টেমে থিতু হতে বাধ্য করেছে। শেষ পর্যন্ত শিম রান্নার নিখুঁত প্রক্রিয়া ফ্রান্সে গিয়ে কথক আত্মস্থ করতে পারেনি। অর্থাৎ বহিরাগত ব্যক্তির ফরাসি-অভিযান ব্যর্থ হয়েছে। এর মাধ্যমে ডায়াসপোরা জনগোষ্ঠীর বিশেষত এশীয়র পক্ষে ফ্রান্সের সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদ ও অপরত্ববোধের বিপরীতে টিকে থাকার চ্যালেঞ্জের গভীর ব্যাপারসমূহ এই উপন্যাসে উঠে এসেছে। যদিও গুরুতর এসব ব্যাপার ঔপন্যাসিক স্যাটায়ারের মাধ্যমে চটুল আকারে তুলে ধরেছেন—নিজের ডায়াসপোরা অভিজ্ঞতাকে এশীয় পর্যটকরূপী কথকের ভাবনা ও বক্তব্যে রূপদান করেছেন। স্ত্রী-কে লেখা পত্রে লেখক তাঁর লেখার সারবত্তা প্রসঙ্গে একটি ব্যাখ্যা প্রদান করেছিলেন। সেখানে তিনি বলেছিলেন, তাঁর লেখার লক্ষ্য জীবনের আক্ষরিক ও ফটোগ্রাফিক বিবরণ তুলে ধরা নয়– বরং তির্যক বক্তব্যের মাধ্যমে 'গোটা ব্যবস্থাটাকেই আক্রমণ' করা।[৩৩] অর্থাৎ তাঁর রচনার ঘটনা, কাহিনি, চরিত্র– সবই লক্ষ্যভেদী; এসবের প্রকাশ হতে পারে চেতনাপ্রবাহরীতিতে, সাধারণ ভাষা-সংলাপে, কিংবা চটুলতাযোগে বা ব্যঙ্গাত্মকভাবে। আর গোটা ব্যবস্থাকে আক্রমণের একটি স্বরূপ আলোচ্য উপন্যাসে উঠে এসেছে হেজিমনি'র আলোকে; কর্তৃত্ববাদী ও অবদমিত দুই ভিন্ন জাতির প্রতিনিধিত্বশীল চরিত্রসমূহের আচরণ ও বক্তব্যে।

সাত

বর্তমান প্রবন্ধে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র সাহিত্যে, বিশেষত তাঁর একটি গল্প ও একটি উপন্যাসে ডায়াসপোরা তত্ত্বের প্রয়োগ পর্যালোচনা করা হয়েছে। তন্মধ্যে তাঁর গল্প অর্থাৎ 'না কান্দে বুবু' দেশীয় প্রেক্ষাপটের; আর উপন্যাস অর্থাৎ *শিম কীভাবে রান্না করতে হয়*, মহাদেশীয় প্রেক্ষাপটে রচিত। প্রথমোক্ত টেক্সট লেখকের আত্মজৈবনিক উপাদান ব্যতিরেকে এবং দ্বিতীয়োক্ত টেক্সট আত্মজৈবনিক উপাদানযোগে রচিত হিসেবে দেখানো হয়েছে। দুটি টেক্সটেই 'যাত্রা' প্রসঙ্গ বিদ্যমান—গল্পে গৃহযাত্রা, উপন্যাসে বিদেশ (ফ্রান্স) যাত্রা। স্থান-কাল-পাত্রগত বিস্তর পার্থক্য সত্ত্বেও দুটি টেক্সটের গুরুত্বপূর্ণ দিক ডায়াসপোরা প্রসঙ্গ। লেখকের ডায়াসপোরা অভিজ্ঞতার বিশেষত সাংস্কৃতিক অভিযোজনগত সংকটের স্বরূপ তাঁর উপন্যাস বিশ্লেষণে যেমন আবিষ্কার করা যায়, তেমনি তত্ত্বীয় প্রতিষ্ঠার পূর্বে কোনো ধারণা কীভাবে জনসমাজ ও জনমনে কার্যকর থাকে— এর প্রতিফলন আলোচ্য গল্পের বিশ্লেষণে উঠে এসেছে। ডায়াসপোরা জীবন ও ডায়াসপোরা সাহিত্য বর্তমান বিশ্বসাহিত্য পরিসরের গুরুত্বপূর্ণ উপজীব্য। লেখকের বিষয়গভীরতা ও অগ্রবর্তী চিন্তার সমকাল-লগ্নতা সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র জন্মশতবর্ষ পরবর্তী সময়ে উপনীত হয়েও কতটা প্রাসঙ্গিক তাঁর সাহিত্যে ডায়াসপোরা ন্যারেটিভ আবিষ্কারের সূত্রে তা উপলব্ধ হয়—সেই সঙ্গে জারি থাকে ওয়ালীউল্লাহ্-সাহিত্যের পুনর্পাঠের সম্ভাবনা ও প্রয়োজনীয়তা।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১ সংশয়পূর্ণ এই অর্থে যে, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ডায়াসপোরা ন্যারেটর হলেও চর্চাগত দিক থেকে এদেশে এখনো স্পষ্টভাবে ডায়াসপোরা ও প্রবাসীর মধ্যে ভেদরেখা চিহ্নিত করা হয় না। *দক্ষিণ এশিয়ার ডায়াসপোরা সাহিত্য* গ্রন্থের লেখক মোজাফ্ফর হোসেন লিখেছেন-

...তাঁর বিখ্যাত *লালসালু* উপন্যাসটি ১৯৬৩ সালে প্রথম ফরাসি ভাষায় প্রকাশিত হয়।...১৯৬৭ সালে লেখক নিজেই সেটি ইংরেজিতে অনুবাদ করে *ট্রি উইদাউট রুটস* শিরোনামে প্রকাশ করেন। প্যারিসে বাসের যাত্রাপথে ওয়ালীউল্লাহ্ লেখেন *চাঁদের অমাবস্যা* ও *কাঁদো নদী কাঁদো* উপন্যাস দুটি। তবে এর কোনোটিই ডায়াসপোরা সংকট নিয়ে নয়। ষাটের দশকের শেষদিকে লেখক *দ্য আগলি এশিয়ান (কদর্য এশীয়)* নামে ইংরেজি ভাষায় একটি উপন্যাস লেখেন। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ১৯৬৫ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ডব্লু. জে. লেদেরের এবং ই. বার্ডিক (১৯৫৮) রচিত *দ্য আগলি আমেরিকান (কদর্য মার্কিনি)* উপন্যাসের প্রত্যুত্তর হিসেবে এটি রচনা করেন। উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ২০১৩ সালে। তিনি বিদেশে বসে ইংরেজিতে কিছু ছোটোগল্পও লিখেছেন। ওয়ালীউল্লাহ্ দীর্ঘ প্রবাসজীবনের কারণে তাঁর নামে বাংলাদেশি ডায়াসপোরা লেখকদের জন্য একটি সম্মাননার প্রবর্তন করেছে বাংলা একাডেমি। যদিও সেখানে ডায়াসপোরা শব্দটি ব্যবহার না করে প্রবাসী বাংলাদেশি লেখক বলা হয়। (মোজাফফর হোসেন, *দক্ষিণ এশিয়ার ডায়াসপোরা সাহিত্য*, পাঞ্জেরী পাবলিকেশন্স লি:, ঢাকা, ২০১৯, পৃ. ৫৯)

২ অভীক গঙ্গোপাধ্যায়, *সাহিত্যতত্ত্ব ও সমালোচনা : বিবর্তনে অনুবর্তনে*, বিগ বুকস, কলকাতা, ২০১৯, পৃ. ২৮৯

৩ মোজাফ্ফর হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

৪ মোজাফ্ফর হোসেন প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫

৫ সৈয়দ আবদুল মকসুদ, *স্মৃতিতে সৈয়দ উয়ালীওল্লাহ্*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ৪৮

৬ আন মারি ওয়ালীউল্লাহ্, *আমার স্বামী ওয়ালী*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ৫৫ - ৫৬

৭ মোজাফ্ফর হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫

৮ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, *গল্পসমগ্র*, অবসর, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ৬৬

৯ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, প্রাগুক্ত পৃ. ১৪

১০ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

১১ মোহাম্মদ আজম, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'না কান্দে বুবু' : একটি পাঠ, Maosufa Ferdousi (edited), *Dhaka Commerce Collage Journal*, Vol. 1, No-2, Dhaka, 2003, P-83

১২ আবদুল মান্নান সৈয়দ, *রচনাবলি-২*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা ২০১৫, পৃ. ৫৭৩

১৩ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৮

১৪ আবদুল মান্নান সৈয়দ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭৩

১৫ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০২

১৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৬

১৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৪

১৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০২

১৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৪

২০ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৮

২১ শিবব্রত বর্মন অনূদিত *কদর্য এশীয় (দ্য আগলি এশিয়ান)* উপন্যাসের সাজ্জাদ শরীফের লেখা ভূমিকায় উপন্যাসটিকে তিনি সাম্রাজ্যবাদবিরোধী টেক্সট হিসেবে বিবেচনা করার যৌক্তিকতা নিরূপণ করেছেন। (সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, *কদর্য এশীয়*, শিবব্রত বর্মন অনূদিত, অবসর, ২০০৬, ঢাকা) পরবর্তীতে এই সত্যতা প্রশ্নাতীতভাবে গ্রহণ করে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এই টেক্সটকে পাঠ ও বিশ্লেষণ করেছেন অনেকে। *শিম কীভাবে রান্না করতে হয় (হাউ ডাজ ওয়ান কুক বিন্স)*-এর অনুবাদকও শিবব্রত বর্মন। এর ভূমিকায় সৈয়দ আবুল মকসুদ লিখেছেন—

ইউরোপীয় উপনিবেশবাদীরা অহংকারী। তারা গর্বিত তাদের সভ্যতা, সম্পদ ও সংস্কৃতি নিয়ে। তারা হেয় জ্ঞান করে এশীয়দের। যে এশীয়দের তারা শোষণ ও লুণ্ঠন করেছে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে। তিনি চেয়েছিলেন এশিয়াবাসীর আবেগ ও বঞ্চনার কথা পশ্চিমি পাঠকের কাছে স্যাটায়ারের মাধ্যমে উপস্থাপন করতে। *শিম কীভাবে রান্না করতে হয়* সেই লক্ষ্যেই রচিত। (সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, *শিম কীভাবে রান্না করতে হয়*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ১০)

নান্দীপাঠ (সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ সংখ্যা)-য় ২০১৪ সালে সন্নিবেশিত অনিরুদ্ধ কাহালির প্রবন্ধ *'শিম কীভাবে রান্না করতে হয় : ঔপনিবেশক বনাম উপনিবেশিত'*-তে প্রাবন্ধিক সুস্পষ্টভাবে এই টেক্সটকে উত্তর-ঔপনিবেশিক টেক্সট হিসেবে বিবেচনা করেছেন। *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকায়* (ছত্রিশতম খণ্ড-২০১৮) মোস্তাক আহমাদ দীন 'ওয়ালীউল্লাহ্র ইংরেজি উপন্যাসের বিষয়বস্তু' প্রবন্ধেও অনুরূপ বিশ্লেষণ করেছেন। এভাবে দৈনিক ও অন্যান্য সাহিত্যপত্রে এই টেক্সটকে উত্তর-ঔপনিবেশিক টেক্সট হিসেবেই পাঠ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

২২ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, *কদর্য এশীয়*, শিবব্রত বর্মন অনূদিত, অবসর, ঢাকা, ২০০৬

২৩ আন মারি ওয়ালীউল্লাহ্, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪

২৪ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, *শিম কীভাবে রান্না করতে হয়*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ১১

২৫ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

২৬ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

২৭ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

২৮ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

২৯ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩-৩৪

৩০ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১-৪২

৩১ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

৩২ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩-২৪

৩৩ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫-৩৬